অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

www.sa

দৈনিক সমকাল, ২০১৯-১০-১৪, পৃ- ০৮,

East West University LIBRARY

ছাত্র রাজনীতি একেবারে বন্ধ নাকি আমূল সংস্কার

শিক্ষাঙ্গন | মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী

বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরারের বর্বর ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত বিতর্কটি পুনরায় সামনে এসেছে। বহুবার এ বিষয়ে উত্তাপ-উত্তেজনা ছড়ালেও কোনো মৌলিক বা ফলপ্রসূ সমাধান এখনও জাতির কাছে অধরা থেকে গেছে।

সমাজের একজন সচেতন, বর্ষীয়ান নাগরিক হিসেবে ছাত্র রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলার তাগিদ অনুভব করছি। মনে রাখা ভালো, ব্রিটিশ বিতাড়নের পরপরই দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চরম অবিচারের অশনিসংকেতের কথা মাথায় রেখেই ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগের জন্ম হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের সূচনা ঘটে এর এক বছর পর। তবে তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে ছাত্রলীগের বাইরেও একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল ধারার ছাত্র রাজনীতি বিরাজমান ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম ব্রাদারহুডও তখন বেশ শক্তিমান। মহান ভাষা আন্দোলন, '৫৪ সালের নির্বাচন, '৫৮ সালের সামরিক আইনবিরোধী প্রতিরোধ, '৬২ সালের শিক্ষানীতিবিরোধী অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন, ৬ দফার প্রতি সমর্থন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধা প্রদান, স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও গৌরবে উজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশাল ভূমিকা রেখেছে এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা। বলতে দ্বিধা নেই, পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে, বিশেষ করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্র রাজনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা মুখ্য শক্তি ছিল। দক্ষিণপন্থি ও সরকারের অনুগত বলে আখ্যায়িত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন-এনএসএফের দৌরাত্ম্য ষাটের দশকে সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি ছাত্রশক্তিও মোটামুটি একটি উপস্থিতির জানান দেয়। সামনে আসে ইসলামী ছাত্র সংঘ, যা আজকের দুর্ধর্ষ ছাত্রশিবিরের পূর্বসূরি।

১৯৬২ সালের শেষাশেষি সার্বসিডিয়ারি পরীক্ষা হয়ে গেলে ছাত্র ইউনিয়নের বড় নেতাদের 'পরামর্শে' আমি ঢাকা হল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ্ হল) থেকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবাহী এসএম হলে স্থানান্তরিত হই। এর পরই জানতে পারি, ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য এসএম হলের ছাত্র সংসদের সহসভাপতি পদে মনোনীত হবো আমি। বাস্তবে হলোও তাই। তবে আমার পীড়াপীড়িসহ অন্যান্য কারণে ছাত্রলীগের সঙ্গে কোয়ালিশন হয়। ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগের সম্মিলিত প্যানেল জাগৃতি থেকে ফরাসউদ্দিন-মোহাম্মদউল্লাহ (ছাত্রলীগ) অন্য প্রবল এনএসএফ-ছাত্রশক্তি প্যানেলের শামসুল হুদা-আনোয়ারুল করিম চৌধুরীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। এখানে প্রথম শিক্ষা যেটি পাই সেটা হলো- নিরপেক্ষ, যথার্থ ও স্বচ্ছ নির্বাচনে জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয় বলে দুই প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে আজ পর্যন্ত সৌহার্দ্য ও শত্রুতার কমতি আসেনি।

নির্বাচিত হওয়ার পরপরই অভিষেক অনুষ্ঠান। বক্তৃতাক্ষেত্রে আমার একেবারেই দুরবস্থা। বন্ধুবর জালাল চমৎকার একটি খসড়া তৈরি করে দিলে দুরু দুরু বক্ষে মোটামুটি মুখস্থবিদ্যার প্রয়োগ মাধ্যমে উতরে যাই। কিন্তু অভিষেক-পরবর্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সময় খুবই বিপাকে পড়েছিলাম। বিরোধীপক্ষের দু'একজনের প্রতিহিংসার আগুনে দক্ষিণপন্থি সব আর্টিষ্ট শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানে আসতে অস্বীকৃতি জানান। রক্ষা পাই পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার আনোয়ারউদ্দিন খান, বন্ধু-সহপাঠী ফাহমিদা খাতুন, সহমর্মী শিল্পী আবেদা খাতুন আর সাড়ে চার বছরের অঞ্জনা সাহার উচ্চমানের গান ও নাচের কারণে।

পরপরই গলদঘর্ম হই ১৯৬৩-৬৪ অর্থবছরে এসএম হলের বাজেট প্রস্তুতিকালে। বেশ পড়াশোনা ও উত্তরসূরিদের দিকনির্দেশনায় বাজেট তৈরি করি। কিন্তু বিরোধীপক্ষের ব্যাপক প্রস্তুতি আর বিজয়ী প্যানেলের অতিশয় আত্মবিশ্বাসের কারণে বাজেটের ভোটাভুটিতে হেরে যাই। সম্ভবত অচলাবস্থা দূর করতে এবং আমার প্রতি স্নেহ-মমতার কারণে ট্রেজারার মহোদয়ের সুপারিশে হলের প্রভোষ্ট বাজেটটি প্রত্যায়িত করেন। বাজেট অধিবেশনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়- ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমি ইউনিয়নের বেয়ারাকে দিয়ে রুমে নাশতা আনাই। ভালো শিক্ষাই হলো বটে।

পরবর্তী সময়ে প্রভোষ্ট অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদ এবং হাউস টিউটর এমএ করিম ও সর্বজনপ্রিয় গিয়াসউদ্দিন আহমেদের (মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) স্নেহ দিকনির্দেশনায় কেবিনেটের (মোহাম্মদউল্লাহ, আব্দুল মান্নান, খালেদ রব, সাইফুল ইসলাম খান, মোবারক হোসেন প্রমুখ) দক্ষতা এবং ছাত্রবন্ধুদের সহযোগিতায় সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হয়। জমে ওঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ১৯৬৪ সালে পূর্ববাংলায় ১১টি টেলিভিশন সেট আসে। সৌভাগ্যবশত একটা মোক্ষম যোগাযোগের কারণে তার একটি আমি এসএম হলের জন্য বরাদ্দ করাতে পারি।

শুধু আমাদের ছাত্র পরিষদকাল ১৯৬৩-৬৪ বছর নয়; ষাটের দশকে পূর্ব বাংলা, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছিল অগ্নিগর্ভ রত্নপ্রসব করা একটি সময়। মওদুদ আহমদ বনাম এনায়েতুল্লাহ খানের 'মুক্তবিশ্ব' বনাম 'আয়রন কার্টেন' বিতর্ক এমনকি পিংপং খেলা যেমন উপভোগ করেছি, তেমনি পচে যাওয়া দক্ষিণপন্থি ছাত্র রাজনীতির ধ্বংসলীলার তাণ্ডবও দেখেছি। মেনন, রেজা আলী ও পরিতোষকে মিথ্যা অজুহাতে হকিস্টিক (বর্তমানে একটি নস্যি বৈ আর কিছু নয়) দিয়ে নির্মম পেটানো প্রত্যক্ষ করেছে ছাত্রছাত্রীরা। আবার ক্ষমতার লোভ-লালসা, সুবিধাবাদের কানাগলিতে ছাত্র ইউনিয়নকে বহুধাবিভক্তির মাধ্যমে ক্ষীয়মাণ ধারায় নেমে আসতেও দেখা গেছে। তবে 'পাসপার্ট টু' ও খোকার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ডানপন্থি এক দানবশক্তির ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেলেও সন্ত্রাস, বর্বরতা, নাশকতা, বোমা-গ্রেনেড এবং মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের জন্ম হতেও প্রত্যক্ষ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরা এখন একটি গর্বিত স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। বিশ্ব এখন অবাক বিস্ময়ে সাধুবাদ দিচ্ছে উন্নত সমৃদ্ধ দরিদ্রমুক্ত দেশে শুধু ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়নসহ হৃদয় উষ্ণ করা সামাজিক রূপান্তরে। এ ধারাকে শুধু ধরে রাখার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার সমকক্ষ না হলেও প্রায় সমমাপের নেতৃত্ব তৈরির কোনো বিকল্প নেই। তাই নেতৃত্ব তৈরির সূতিকাগার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য ছাত্র রাজনীতিতে যে গুণগত পরিবর্তন ও আমূল সংস্কার প্রয়োজন- তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ঘটনাবলির একজন সতর্ক পর্যবেক্ষক হিসেবে আমি মনে করি, প্রতি বছর স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে হল ইউনিয়ন নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত পরিষদকে নেতৃত্ব, সংগঠক, বাজেট প্রণেতা, দরিদ্র নিরসনকারী, সংস্কৃতি, সাহিত্য বিষয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন, প্রযুক্তি আহরণে কর্মকাণ্ড এবং ক্রীড়া সংগঠন বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই, রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনকে অঙ্গ সংগঠন এমনকি সহযোগী সংস্থার মর্যাদা থেকে অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য বিযুক্ত করার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো এবং কলেজ হোস্টেলে সরকারপ্রধানের নির্দেশ অনুসারে পারতপক্ষে একযোগে অস্ত্রসহ সন্ত্রাস ও র‍্যাগিংয়ের সব উপকরণ জব্দ করা এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা শিক্ষাঙ্গন ও আইন-শৃঙ্খলা প্রশাসনের যৌথ দায়িত্ব হওয়া উচিত। আবাসপ্রত্যাশী ছাত্রসংখ্যার তুলনায় সিট সংখ্যা কম। জরুরি ভিত্তিতে হল নির্মাণ করা যায়। তবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের মূল কাজ পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে সে জন্য সময়মতো পরীক্ষা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কাজটি যেন নিয়মে পরিণত হয়। পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনকারী সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের মেধার ভিত্তিতে সিট বরাদ্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শিত পথে চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে হলত্যাগের রীতি চালু করতে হবে। এক সিটে একাধিক ছাত্র থাকবে না। কমন রুম ও করিডোরে বিদ্যার্থীরা আবাস করবে না। টর্চার সেল বা কমন রুম সংস্কৃতি যেন আবার দেখা না দেয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাজনীতি না চাইলে ছাত্র রাজনীতি কখনও সুস্থ সৃজনশীল নেতৃত্ববিকাশী ধারা থেকে বিচ্যুত হবে না। ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও পরামর্শ নিয়ে শিক্ষকমণ্ডলী আগামী দিনের চৌকস নেতৃত্ব সৃষ্টি করবেন। তবে শিক্ষক রাজনীতিতে ছিত্যাবস্থা থাকলে কি সেটা সম্ভব!

রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনকে অঙ্গ সংগঠন এমনকি সহযোগী সংস্থার মর্যাদা থেকে অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য বিযুক্ত করার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো এবং কলেজ হোস্টেলে সরকারপ্রধানের নির্দেশ অনুসারে পারতপক্ষে একযোগে অস্ত্রসহ সন্ত্রাস ও র‍্যাগিংয়ের সব উপকরণ জব্দ করা এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা শিক্ষাঙ্গন ও আইন-শৃঙ্খলা প্রশাসনের যৌথ দায়িত্ব হওয়া উচিত